যিলক্বদ মাসে করণীয় ও বর্জনীয়

যিলক্বদ মাসে কোন ইবাদত আল্লাহ রাখেন নি। নামাযের প্রস্তুতি যেমন উযু ঠিক তেমনি যিলহাজ্জের প্রস্তুতি হলো যিলক্বদ। এই মাস ইবাদাত শিখার জন্য রাখা হয়েছে। উলামাদের নিকট থেকে জিলহাজ্জ মাসের করণীয় বিষয়গুলো কিভাবে করতে হবে তা শিখতে হবে। এবং যিলহাজ্জ মাসের যে ইবাদত রয়েছে তার কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে তা জেনে তা থেকে নসীহত হাসিল করতে হবে। যেমনঃ বাইতুল্লাহ কিভাবে পূনঃনির্মান হলো তার ঘটনা পুরোটা সামনে আসবে। তারপর হজ্জের ঘটনা, কুরবানীর ঘটনা ইত্যাদি। ইতিহাস জানতে আমরা যে সকল কিতাব পড়বো তা কোন ভালো আলেম থেকে পরামর্শ করে কিতাব সম্পর্কে জেনে নিবো। নিম্নে হাজ্জ এবং কুরবানীর ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে এবং তা থেকে শিক্ষনীয় বিষয়গুলো দেয়া হলোঃ

হজ্জ এবং কুরবানীর ঘটনা

প্রিয় জন্মভূমি, পিতা-মাতা, আত্মীয় পরিজন ও হিতাকাঙ্খী বন্ধু-বান্ধব সহ নিজের সব কিছু পরিত্যাগ করে ছিয়াশি বৎসরের বৃদ্ধ বয়সে কেনানে তিনি অনেকটা আপনজনহীন জীবন-যাপন করছিলেন। আর এতোকাল পর্যন্ত তাঁর ঔরসে কোন সন্তান জন্মে ছিল না। এজন্য তখন তিনি আল্লাহ পাকের নিকট সন্তান কামনা করে দু'আ করলেন। তাঁর মুনাজাত কবুল হলো। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এক ধৈর্যশীল সুসন্তানের শুভ সংবাদ দিলেন। সে অনুযায়ী কিছুদিন পর হযরত হাজেরার رضي الله عنها গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হল। তার নাম রাখা হল-ইসমাঈল।

কেনানে অবস্থানকালে হযরত ইসমাঈল যখন দুগ্ধ পোষ্য শিশু, তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে হযরত ইবরাহীমের আ. প্রতি নির্দেশ এলো-বিবি হাজেরা رضي الله عنها সহ কলিজার টুকরো একমাত্র ছেলে সন্তান হযরত ইসমাঈল আ. কে আরবের মরু প্রান্তরে নির্বাসনে রেখে আসতে। এ মহা পরীক্ষার মুখে সামান্যতম বিচলিত না হয়ে নির্দ্বিধায় তিনি স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে মক্কার সেই জন-মানবহীন মরু ভূমিতে সামান্য কিছু খেজুর আর অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে রেখে এলেন। কিছু দিনের মধ্যে। সেই সামান্য খেজুর ও পানিটুকু শেষ হয়ে গেলে। পানির পিপাসায় কাতর-তৃষ্ণার্ত ছেলের করুণ অবস্থা দেখে হযরত হাজেরা رضي الله عنها পানির সন্ধানে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকেন। সাফা-মারওয়া তার সেই দৌঁড়াদৌড়ি আল্লাহ তা'আলার নিকট এতই পছন্দনীয় হয়েছিল যে, কিয়ামত পর্যন্ত সেটাকে হজ্বের আহ্কামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে সেই ইতিহাস চির অম্লান করে রেখেছেন। আর হযরত হাজেরা رضي الله عنها পানি না পেয়ে ফিরে এসে অতীব বিস্ময়ে দেখতে পেলেন- হযরত ইসমাঈলের আ. পায়ের গোড়ালির নিকট হতে মাটি ফেটে পানি উথলিয়ে উঠছে। জিব্রাইল আ. তার বাজু দিয়ে আঘাত করেছিলেন। ঐ আঘাতে তার পায়ের থেকে পানির ফোয়ারা বের হয়ে এই জমজম কুপের আবিষ্কার হয়েছে। এই পানিকেই যমযমের পানি বলে। যমযমের পানি হাউসে কাউসার পানি থেকে বেশী বরকতময়। এই জন্য মেরাজে নেয়ার আগে রাসূল সা. এর সিনা চাক করার সময় জিব্রাইল আ. জান্নাত থেকে সব জিনিসই এনে ছিলেন কিন্তু পানি আনেন নি। যমযমের পানি ব্যবহার করে ছিলেন। এই পানি যেকোন বান্দা যে কোন নিয়তে পান করবে আল্লাহ তা পূরণ করবেন। এই পানিতে পানি ও আছে খানাও আছে। এই পানিতে যত পানি মিশানো হোক তার বরকত কমবে না। এই পানি কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। এর লেবেল কখনো কমবে না। তা-ই আজ যমযম কূপ নামে অভিহিত। হযরত ইবরাহীম আ. এর স্ত্রী পুত্র আরবের সেই মক্কা-মরু নির্জন অঞ্চলে থাকতেন। আর হযরত ইবরাহীম আ. থাকতেন সিরিয়ার কেনানেই। মাঝে মাঝে মক্কায় এসে তিনি তাঁদেরকে দেখে যেতেন।

একবারের ঘটনা, হযরত ইবরাহীম আ. মক্কা এলেন। তখন ইসমাঈল আ. সবেমাত্র কৈশোর পেরিয়ে তের বৎসর বয়সে পিতার সঙ্গে এদিক সেদিক আসা-যাওয়া এবং পিতার বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করে তাঁকে সহায়তা করার মত বয়সে উপনীত হয়েছেন, বা মতান্তরে তিনি তের বৎসরের হয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে শিখেছেন, তখন হযরত ইবরাহীম আ. একদিন স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত ইসমাঈলকে আ. স্ব হস্তে যবেহ করছেন। সকালে ঘুম হতে উঠে সারা দিন তিনি এ চিন্তায়ই মগ্ন রইলেন যে, এ স্বপ্ন সত্যি সত্যিই আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে দেখানো হয়েছে, নাকি শয়তান আমাকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করছে। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝেই তিনি রাতে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ রাতেও আবার একই স্বপ্ন দেখলেন। কারো কারো মতে তৃতীয় রাতেও আবার একই স্বপ্ন দেখলেন। পরপর দুই বা তিন রাতে একই স্বপ্ন দেখার পর এবার তিনি নিশ্চিত হলেন যে, এ স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতেই। আর নবীদের স্বপ্ন যেহেতু ওহী তথা আল্লাহ তা'আলার আদেশরূপে গণ্য হয়ে থাকে, সেহেতু এ স্বপ্নের মর্মার্থ এটাই ছিল যে, "হে ইবরাহীম! তুমি তোমার প্রাণপ্রিয় পুত্রকে কুরবানী (যবেহ) করে আমার নামে উৎসর্গ করে দাও।" সে মুতাবেক হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহর আদেশ পালনে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে খোদার আদেশ পালনের ব্যাপারে তাঁর সন্তানের মনোভাব জানবার জন্য স্বপ্নের কথা উল্লেখ করত: তাঁর অভিমত চাইলেন। হযরত ইসমাঈল আ. কে আল্লাহ তা'আলা এ ছোট বয়সেই যে ইল্ম ও বুঝশক্তি দিয়েছিলেন, তার গুণে স্বপ্ন শোনা মাত্রই তিনি বুঝে ফেললেন- এ তো আল্লাহর হুকুম। যেহেতু নবীর স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। তাই কোন প্রকার দ্বিধা না করে তৎক্ষনাত তিনি আল্লাহর হুকুম বুঝতে পেরে আল্লাহর নামে জীবন উৎসর্গ করে দেয়ার আবেগ ও আগ্রহ প্রকাশ করে বললেনঃ "হে আব্বাজান, আল্লাহ পাক আপনাকে যে নির্দেশ দিচ্ছেন, তা আপনি যথাযথ পূর্ণ করুন। এ ব্যাপারে আপনি কোন প্রকার দ্বিধা করবেন না। আর আমার জন্যও কোন রকম চিন্তা করবেন না। আমি কথা দিচ্ছি- সেই কঠিন মুহূর্তেও আপনি আমাকে ইনশাআল্লাহ ধৈর্যশীল পাবেন।'

সুযোগ্য পুত্রের মুখে এমন বুদ্ধিদীপ্ত আত্মোসর্গের স্পৃহা ও অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুটিত হচ্ছিল। ইবরাহীম আ.আশ্বস্থ হলেন এবং খুশীতে তাঁর মন ভরে উঠলো।

এখানে কতগুলো লক্ষণীয় ও শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রথমত হযরত ইবরাহীম আ. কে ফেরেশতার মাধ্যমে সরাসরি হুকুম না করে স্বপ্নে দেখিয়ে ছিলেন। বাহ্যত এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ইবরাহীম আ.-এর প্রভু আনুগত্য যেন পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। নতুবা স্বপ্নে প্রাপ্ত আদেশে আসল উদ্দেশ্য পাশ কাটিয়ে ইচ্ছা মাফিক অন্য কোন ব্যাখ্যা বের করে নেয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু হযরত ইবরাহীম আ.- এ ধরনের কোন পন্থা অবলম্বন না করে স্বপ্নের পরিষ্কার অর্থ যা, তার উপর আমল করতে প্রস্তুত হয়ে যান।

তাছাড়া এ আদেশের উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, সত্য সত্যই ইসমাঈলকে যবেহ করা হবে। বরং আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য এতটুকুই ছিল যে, করেন। যাতে প্রভুপ্রেমে ত্যাগ স্বীকার তিনি কতটুকু আন্তরিক একনিষ্ঠ তার পরীক্ষা হয়ে যায়।

সে মুতাবেক হযরত ইবরাহীম আ. স্বীয় পুত্রকে যবেহ করতে পূর্ণ প্রস্তুতি নিলেন। এ পরীক্ষাও সম্পন্ন হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নও বাস্তবায়িত হলো। পক্ষান্তরে আল্লাহপাক যদি সরাসরি হুকুম করতেন, তাহলে পরে আবার ইবরাহীম আ.-এর পরীক্ষা সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহর এ হুকুমটি রহিত করতে হতো এবং তখন আল্লাহ তা'আলার একটি হুকুম অকার্যকর গণ্য হত।

উল্লেখ্য যে, হযরত ইসমাঈল আ. পিতার মুখ থেকে আল্লাহ তা'আলার কোন হুকুমের কথা শুনেই আল্লাহর রাহে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ব্যক্ত করার সাথে সাথে পিতাকেও যেভাবে সান্তনা দিয়ে আশ্বস্থ করে এই মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সহায়তা করেছেন, তাঁকে যবেহ করার চরম মুহূর্তে ধৈর্যের যে চরম পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন এবং পিতাকে যে সকল গুরত্বপূর্ণ ও সৎপরামর্শ দিয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্যে আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য অনেক মূল্যবান শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। আলোচনার শেষাংশে তা উদ্ধৃত হবে।

মূল ঘটনাঃ

খলীলুল্লাহ ইবরাহীম আ. মহান আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে কুরবানীর নির্ধারিত স্থান মিনা'র পানে রওয়ানা হলেন।

আল্লাহর ইশক ও আনুগত্যের এমন মহান দৃষ্টান্ত দেখে ইবলিস শয়তানের আর সহ্য হচ্ছিল না। সে জানতো, আল্লাহর আনুগত্যে দৃড়পদ ইবরাহীম আ.-কে মুকাবিলা করে এতটুকুও টলানো যাবে না। তাই সে প্রথমে অতিশয় দয়ালু ও সহানুভূতিশীল মানুষের আকৃতিতে হযরত ইসমাঈলের আ. মাতা হযরত হাজেরা رضي الله عنها-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলোঃ ইসমাঈল কোথায় গিয়েছে? হাজেরা উত্তর দিলেন- সে তো তাঁর আব্বার সঙ্গে জঙ্গল হতে কাষ্ঠখড়ি আনতে গিয়েছে। শয়তান বললো-তুমি জানোনা, তাঁর পিতা তাকে যবেহ করতে নিয়ে গেছে। হযরত হাজেরা رضي الله عنها পাল্টা প্রশ্ন করলেন: এমন কোন পিতাও কি কোথাও আছে, যে আপন সন্তানকে যবেহ করে? শয়তান বললো- তিনি বলেন যে, আল্লাহ নাকি তাঁকে এ আদেশ দিয়েছেন। এ কথা শুনে যোগ্যমাতা যোগ্য উত্তরই দিলেন যে, বাস্তবিকই যদি আল্লাহর হুকুম হয়ে থাকে, তাহলে তাকে একাজ করতে দেয়াই কর্তব্য।

এখান থেকে শয়তান হতাশ হয়ে পিতা-পুত্রের পিছু অবলম্বন করলো। তারা মক্কা হতে মিনা'র পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। প্রথমে সে ইসমাঈলকে আ. বললো- তুমি কি জানো, তোমাকে তোমার আব্বা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? ইসমাঈল আ.বললেন, আমরা এ উপত্যকা হতে আমাদের বাড়ীর জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করবো। শয়তান বললো, তুমি জানো না, আমি হলফ করে বলছি তাঁর উদ্দেশ্য তোমাকে গলা কেটে যবেহ করা। ইসমাঈল আ. জিজ্ঞাসা করলেন: আব্বা আমাকে যবেহ করবেন কেন? শয়তান বললো, তোমার আব্বা বলেন যে, তাঁর প্রভু নাকি এরূপ নির্দেশ করেছেন। এ কথা শুনে হযরত ইসমাঈল আ. বললেন, তাহলে আল্লাহ পাক তাঁকে যে হুকুম করেছেন, তিনি তা পালন করবেন। এরজন্য এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত আছি। এখানেও ব্যর্থ হয়ে অবশেষে সে বন্ধু বেশে হযরত ইবরাহীম আ.-এর সম্মুখে উপস্থিত হলো এবং সহানুভূতির কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলোঃ কোথায় যাচ্ছেন চাচাজান! হযরত ইবরাহীম আ. উত্তরে বললেন, আমি বিশেষ এক কাজে এ উপত্যকায় যাচ্ছি। শয়তান-বললো-আমার বিশ্বাস শয়তানই আপনাকে আল্লাহর নাম করে স্বপ্নের মধ্যে পুত্রকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছে। এমন কথা শুনে হযরত ইবরাহীম আ. শয়তানকে চিনে ফেললেন এবং তার কুমতলব টের পেয়ে গেলেন। তিনি ধমক দিয়ে শয়তানকে বললেন- 'হে আল্লাহর দুশমন! তুই আমার এখান থেকে সরে যা। আমি যে কোন মূল্যে আমার প্রতিপালকের আদেশ পালনের লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাবো।' এখানেও শয়তান ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। এরপরে যখন হযরত ইবরাহীম আ.জামরায়ে আকাবা (হজ্জের মধ্যে শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করার প্রান্ত স্তম্ভ) এর নিকট পৌছলেন,তখন শয়তান সেখানে এক বিশালকায় আকৃতিতে ইবরাহীম আ.-এর গতিরোধ করে সামনে দাঁড়াল। হযরত ইবরাহীম আ.-এর সঙ্গে পূর্ব থেকেই একজন ফেরেশতা নিযুক্ত ছিলেন। ফেরেশতা বললেন, শয়তানকে পাথর মারুন। ইবরাহীম আ. 'আল্লাহু আকবার' বলতে বলতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলে শয়তান পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। এখান থেকে সামনে অগ্রসর হলে, শয়তান পুনরায় জামরায়ে উসতা (মধ্যস্থস্ত)-এর নিকট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করলো। তখন এখানেও হযরত ইবরাহীম আ. তাকবীর ধ্বনি দিয়ে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করে শয়তানকে তাড়িয়ে দিলেন। অতঃপর জামরায়ে উলা (১ম স্থস্ত)-এর নিকট পৌঁছলে, তৃতীয়বারের মত শয়তান হযরত ইবরাহীম আ.-এর পথরোধ করে দাঁড়াল। এখানেও তিনি কঙ্কর মেরে শয়তানকে হটিয়ে দিলেন। স্মর্তব্য যে, হজ্জে শেষ পর্যায়ে রমীর (কংকর নিক্ষেপের) যে বিধান রয়েছে, তা হযরত ইবরাহীম আ.এর এই প্রিয় আমলের স্মৃতিকে কিয়ামত পর্যন্ত ধরে রাখার জন্য বিধিবদ্ধ হয়েছে।

মোট কথা, অবশেষে হযরত ইবরাহীম আ. ইসমাঈল আ. কে সঙ্গে নিয়ে মিনা প্রান্তরে এক বিশাল প্রস্তর-খণ্ডের নিকট পৌঁছলেন। ইবরাহীম আ. যখন হযরত ইসমাঈলকে আ. যবেহ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তিনি পিতাকে লক্ষ করে হৃদয়স্পর্শী কণ্ঠে বললেন "আব্বাজান! যবেহ করার পূর্বে আমাকে ভালভাবে বেঁধে নিন, যাতে আমি বেশি দাপাদাপি না করতে পারি। আর আপনার পরিধেয় কাপড় সমূহ গুছিয়ে দূরে সরিয়ে রাখবেন, যাতে সেগুলোতে আমার রক্তের ছিটা লেগে আপনার কষ্টের দরুন আমার সাওয়াব কমে না যায়। আমার রক্তে রঞ্জিত কাপড় দেখলে আম্মাজানও বরদাস্ত করতে পারবেন না। আর আপনি যবেহ করার ছুরিটা ভালভাবে ধারালো করে নিন। আপনি আমার গলায় ছুরি দ্রুত চালাবেন যাতে সহজে আমার জান বের হতে পারে। কারণ, মৃত্যুযন্ত্রণা অতি কষ্টদায়ক। আর আম্মার কাছে গিয়ে আমার সালাম জানাবেন। যদি আপনি ভাল মনে করেন, তাহলে আমার কাপড়গুলো আম্মার কাছে নিয়ে যাবেন। এতে হয়ত আম্মাজান কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন।" স্বীয় প্রাণপ্রিয় ছোট্ট শিশুপুত্রে কোমল মুখে এমন সকরুণ বাক্যাবলী শুনে একজন পিতা হিসেবে হযরত ইবরাহীমের আ.হৃদয়ের অবস্থা কি যে হয়েছিল, তা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। কিন্তু হযরত ইবরাহীম আ. সীমাহীন ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে প্রিয় পুত্রকে বললেন: বৎস! তোমার এ ভূমিকা আল্লাহর আদেশ পালনে আমার জন্য যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। তার জন্য তোমাকে আমার মন থেকে দু'আ দিচ্ছি।

অতঃপর হযরত ইবরাহীম আ. পুত্রের কথা মুতাবেক সবকিছু করে ইসমাঈলকে আ. মাটির উপর চিত করে শুইয়ে দিয়ে গলার উপর ছুরি চালাতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মহান কুদরতে কিছুতেই গলা কাটছিল না। ইবরাহীম আ. পাথরে ঘষে ২/৩ বার ছুরি ধার করে যবেহ করার পুনঃপুনঃ চেষ্টা করলেন। প্রতিবারই স্বজোরে ছুরি চালালেন। কিন্তু প্রতিবারই তিনি আল্লাহর কুদরতের কারণে ব্যর্থ হলেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলার কুদরতীভাবে পিতলের একটি পাত হযরত ইসমাঈলের গলার উপর রেখে দিয়েছিলেন। হযরত ইসমাঈল আ. বললেন, আমার মুহাব্বতেই হয়ত আপনি কর্তব্য পালনে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন। সুতরাং আপনি আমাকে উপুড় করে শুইয়ে যবেহ করুন। হযরত ইবরাহীম আ. তা-ই করলেন। কিন্তু তাতেও কাজ হলো না। ইতিমধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবী আওয়াজ আসলঃ "হে ইবরাহীম! আপনি আপনার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন।" গায়েবী আওয়াজ শুনে তিনি আসমানের দিকে চোখ তুললেন। তখন হযরত জিবরাঈলকে আ. দেখলেন যে, তিনি জান্নাতের একটি সুন্দর ও শিংধারী দুম্বা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। হযরত জিবরাঈল আ. বললেন, আল্লাহ পাক আপনার পুত্রের মুক্তিপন স্বরূপ এই দুম্বাটি প্রেরন করেছেন। অতএব ইসমাঈলের আ. পরিবর্তে আপনি এটাকে যবেহ করুন। তখন হযরত ইবরাহীম আ. ইসমাঈল আ., ফেরেশতা জিবরাঈল আ. ও সেই দুম্বা সকলেই 'আল্লাহ আকবার' বলে উঠলেন।

অতঃপর হযরত ইবরাহীম দুম্বাটিকে ধরে 'মিনা'র 'মানহার'- এ নিয়ে গিয়ে যবেহ করে কুরবানী করে দেন। আর এ দুম্বা বা অন্যকোন চতুষ্পদ জানোয়ার যবেহ করাই কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে প্রিয় বস্তু কুরবানী করার উত্তম দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। এজন্যই প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন কুরবানীর হাকীকত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি উত্তর দিলেন- কুরবানী হচ্ছে তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম আ. এর সুন্নাত। সাহাবীগণ رضي الله عنهم দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন সেই কুরবানীর দ্বারা আমরা কী সাওয়াব পাব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন- কুরবানীর পশুর প্রতিটি পশম ও লোমকুপের বিনিময়ে এক এক নেকী করে পাবে।

হযরত ইবরাহীম আ.- এর উল্লেখিত ঘটনাবলী হতে আমরা নিম্নবর্ণিত বিধিসমূহ শিখতে পারি

আল্লাহর হুকুমকে প্রাধান্য দান

(ক) হযরত ইবরাহীমের আ. ন্যায় আল্লাহর সন্তুষ্টি তথা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হলে নিজের পিতা-মাতা ও সকল আপনজনের আবদার বা দাবীকে উপেক্ষা করে আল্লাহর হুকুমকে প্রাধান্য দেয়া প্রত্যেক মুমিনের জন্য জরুরী। অথচ আজকের মুসলমানগণ বিবাহ-শাদী সহ বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে আল্লাহর হুকুমের অমান্য করে আত্মীয় স্বজনের দাবীর মুখে বিধর্মীদের আচার অনুষ্ঠান কে সগর্বে ও নির্লজ্জভাবে পালন করছে।

হায়াত মউত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য

(খ) আল্লাহর হুকুম মানতে গিয়ে শুধু আত্মীয় স্বজন নয়, বরং গোটা দেশবাসী সহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারীগণও যদি বিরুদ্ধে চলে যায়, তথাপিও কোন মুমিন মুসলমান আল্লাহর হুকুম থেকে এক তিল পরিমাণও হটতে পারে না। কারণ- তার হায়াত-মওত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আর তার ইমাম নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে আত্ম-নিবেদনকারী হযরত খলীলুল্লাহ ইবরাহীম আ.।

হিজরত করা

(গ) দ্বীনের উপর টিকে থাকার জন্য বা দ্বীন শিক্ষার জন্য কিংবা দ্বীন কায়েমের জন্য প্রয়োজন হলে, দেশ-খেশ সব কিছুই ত্যাগ করে আল্লাহর মনোনীত স্থানে হিজরত করতে হবে। যেমন- হযরত ইবরাহীম আ. সিরিয়ায় হিজরত করেছিলেন।

বিবি-বাচ্চা হতে দূরে অবস্থান

(ঘ) আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য এবং দ্বীন পালনের খাতিরে প্রয়োজন হলে বিবি-বাচ্চাদের থেকে দূরে অবস্থান করতে হবে। অর্থাৎ বিবি-বাচ্চা, আল-আওলাদের মুহাব্বত ও আকর্ষণ যেন আল্লাহর ও রাসূলের মহব্বত থেকে নিম্ন স্থরে থাকে। যাতে করে তাদের মুহাব্বতের কারণে

দ্বীনের কাজে কোন বাধা না আসতে পারে, বা দ্বীনের কাজের মধ্যে ক্ষতি না আসে। হযরত ইবরাহীম আ. বিবি হাজেরা ও ইসমাঈল আ.কে আরবের মরু প্রান্তরে রেখে আল্লাহর প্রেমের যে পরম পরাকাষ্ঠ দেখিয়েছিলেন, সেটাই মুমিনের জন্য পালনীয় নমুনা।

দ্বীনী কর্মকারীর জন্য আল্লাহ-ই জিম্মাদার

(ঙ) কোন পিতা বা গার্জিয়ান যখন আল্লাহর হুকুমের খাতিরে বা দ্বীনের জরুরতে বিবি বাচ্চার জন্য যথাসাধ্য ইন্তিজাম করে বের হয়ে পড়ে, তখন স্বয়ং রাব্বুল আলামীন তার বিবি-বাচ্চা ও আল-আওলাদের জিম্মাদার হয়ে যান। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল আ. স্বয়ং। মরু-ভূমিতে হযরত ইসমাঈল আ.-এর পায়ের আঘাতে স্বীয় কুদরতে আল্লাহর তা'আলা পানির ইন্তিজাম করে দিলেন। যার নাম বীরে যমযম- যা কিয়ামত পর্যন্ত কোটি কোটি লোকের তৃষ্ণা নিবারণকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর নিয়ামত। এমন বরকতময় পানি মা হাজেরা রা. এর কুরবানীর বদলায় আল্লাহ দান করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় মেয়েরা আল্লাহর জন্য যখন কুরবানী করেছেন আল্লাহ দুনিয়াতে এর বদলা এমন দিয়েছেন যা বিড়ল। আমাদের মা-বোনরা যদি দীনের জন্য কুরবানী করেন আল্লাহ এর বিনিময় দুনিয়া আখেরাতে অবশ্যই দিবেন এটা আল্লাহ পাকের ওয়াদা।

নিজ সুবিধা মত ব্যাখ্যা দেয়া হারাম

(চ) আল্লাহর হুকুমের মধ্যে নিজের সুবিধামত ব্যাখ্যা দেয়া হারাম। তাতে আল্লাহর হুকুমের গোলামী করা হয় না, বরং নিজের খাহেশাতের গোলামী করা হয়। স্বপ্নের ব্যাপারে ইচ্ছা করলে, হযরত ইবরাহীম আ. বিভিন্ন ব্যাখ্যা বের করতে পারতেন, কিন্তু তিনি সে পথ অবলম্বন না করে স্বপ্নের সহজ সরল ব্যাখ্যা করে কলিজার টুকরা ছেলে-সন্তানকে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। সাধারণদের জন্য উচিৎ প্রতিটা বিষয় আলেম-উলামাদের পরামর্শ অনুযায়ী করা।

সকল ভালোকাজে পিতাকে সাহায্য করা

(ছ) দ্বীনের কাজের মধ্যে পুত্র সর্বক্ষেত্রে পিতার সহযোগী হবে। সকল ভাল কাজে ও দ্বীনের খেমতে পুত্র পিতার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর ভূমিকা পালন করবে। যেমন- হযরত ইসমাঈল আ. নিজের কুরবানীর ব্যাপারে স্বীয় পিতাকে যথার্থভাবে সহযোগিতা করেছিলেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে কামিয়াবীর ঘোষণা

(জ) অনেক সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক কঠিন নির্দেশ আসে, যার বাস্তবায়ন আল্লাহর উদ্দেশ্য থাকে না। তিনি শুধু এতটুকু দেখতে চান যে, বান্দা তার সকল প্রকার হুকুম শিরোধার্য করে নেয়র জন্য প্রস্তুত আছে কি না? বান্দা যখন তার প্রস্তুতি শেষ করত: আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য নিজেকে পেশ করে, তখন আল্লাহর তা'আলা তাকে আর ঐ কঠিনতম কাজ করতে দেন না, বরং যতটুকু করেছে, তার উপর বান্দার কামিয়াবীর ঘোষণা করে নিজের খুশী প্রকাশ করে দেন। আর এ জন্য শেষ পর্যন্ত হযরত ইসমাঈল আ.কে কুরবানী না হতে দিয়ে তার বদলে দুম্বা কুরবানী করিয়ে পিতা পুত্রের কামিয়াবীর ঘোষণা দিলেন।

উভয় জগতে উত্তম প্রতিদান লাভ

(ঝ) পিতা যখন আল্লাহর নির্দেশে স্বীয় পুত্রকে বা নিজের প্রিয় বস্তুকে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন আল্লাহর তা'আলা ব্যক্তি এবং তার প্রিয় বস্তুকে কবুল করে নেন এবং তাদেরকে উভয় জগতে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন। হযরত ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল আ. এর সেই মহাত্যাগ তথা কুরবানীর কারণে আল্লাহর তা'আলা ইবরাহীমকে আ. নিজের খলীল (একান্ত বন্ধু) উপাধিতে ভূষিতে করেছেন এবং পিতা পুত্র উভয়কে বিশ্ববাসীর জন্য ইমাম বা অনুসরনীয় বানিয়ে দিয়েছেন।

আজ যদি প্রত্যেক পিতাকে এ নির্দেশ দেয়া হতো যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্বীয় প্রাণপ্রিয় পুত্রকে কুরবানী করতে হবে, হবে আল্লাহপাক-ই ভাল জানেন যে, এ পরীক্ষায় কতজন কামিয়াব হতো। আল্লাহর তা'আলার অসীম মেহেরবানী যে, তিনি বান্দার দুর্বলতার প্রতি লক্ষ করে এ কঠিনতম নির্দেশ দেননি। বরং এর চেয়ে বহু গুণ সহজে এক নির্দেশ তিনি পিতাকে দিয়েছে যে, "আমার সন্তুষ্টির জন্য তুমি নিজের পুত্রকে আমার কালাম কুরআনে পাক ও দ্বীন শিক্ষা দাও। এটা তোমার পক্ষ থেকে তোমার ছেলের কুরবানী হয়ে যাবে। আর এর বদৌলতে আমি পিতা-পুত্র উভয়কে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদান ও পুরষ্কার দান করবো।" আফসোসের বিষয়! কতজন মুমিন মুসলমান যারা প্রতি বছর কুরবানী করছেন, বা কুরবানীর ওয়াজ গুনছেন তারা আল্লাহর এ গুরু নির্দেশ পালন করতে পেরেছেন কি? নির্দেশ পালন তো দূরের কথা, উপরন্তু কুরআনের তা'লীমকে তারা ফকীরের বিদ্যা উপাধি দিয়ে ইংরেজী বিদ্যাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। অথচ আল্লাহর দরবারে ইংরেজী বিদ্যার কোন ফযীলত নেই। আর মুসলমানদের জন্য এর চেয়ে চরম অধঃপতন ও দুঃসাহস আর কি হতে পারে যে, সাধারণত যে পরিবেশে ও শিক্ষায় বদদ্বীন আর নাস্তিক পয়দা হয় ও হচ্ছে, সেই পরিবেশে পাঠানোর জন্যে কত রকম প্রচেষ্টা, পয়সা খরচ ও তদবীর। পক্ষান্তরে আল্লাহর কালাম রাসূলের হাদীস শিক্ষা দেয়ার জন্য সামান্য ত্যাগ বা চেষ্টাও নেই। উপরন্তু সেই ব্যাপারে কথা বললে, তার কত রকম উল্টা পাল্টা জবাব ও প্রতিবাদ আসে। এমনকি কেউ আল্লাহর মুহাব্বতে আসক্ত হয়ে স্বীয় পুত্রকে দ্বীন শিখতে দিলে অনেকেই তৈরী হয়ে যায় সমালোচনার ঝড় তোলার জন্যে। এতটুকুও বলেঃ তোমার এত ব্রেনী ছেলেটার দেমাগ কুরআন পড়িয়ে একেবারেই নষ্ট করে দিলে? (নাউজুবিল্লাহ) এ ধরনের কথা যার বলে, তাদের ঈমানহারা হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে।

নেক কাজ ও মন্দ কাজের নগদ লাভ-ক্ষতি

(ঞ) যারা নেক কাজ করে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে দুনিয়াতে ইজ্জত-সম্মান এবং সুনাম-সুখ্যাতি দান করেন, আর আখেরাতে তো মহা কল্যাণ আছেই। কুরআনের বিদ্যা অর্জনকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়ারিশ। তার জন্য পৃথিবীর সমস্ত মাখলুক দু'আ করে থাকে। তার থেকে মর্যাদাশীল আর কেউ হতে পারে না। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর হুকুম-আহকাম মান্য করে না, আল্লাহর তা'আলা দুনিয়াতে তাদেরকে বে-ইয্যত করেন,তাদের লক্বব বা উপাধি হয় ফাসেক-ফাজের। আর তাদের দুনিয়ার যিন্দেগী হয় তিক্ততাময়। অথচ দুনিয়াতে তারা যদি কারূনের ধন বা ফিরআউনের রাজত্বের অধিকারীও হয়ে যায়, পরকালে তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

হাজ্জ এর আহকামসমূহ

উমরা পালন করার নিয়ম

ইহরাম বাঁধা (ফরয): উমরা পালনকারী মীকাতে পৌঁছে অথবা তার পূর্ব হতে গোসল বা উযূ করে (পুরুষগণ ইহরামের কাপড় পরে) ২ রাকা'আত নামায পড়ে মাথা হতে টুপি ইত্যাদি সরিয়ে কেবলামুখী হয়ে উমরার নিয়ত করবে। নিয়ত শেষে অন্ততঃ ৩ বার (পুরুষগণ সশব্দে) ৪ শ্বাসে তালবিয়াহ পাঠ করবে। তালবিয়া এই

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ –
لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ –
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ –
لاَ شَرِيكَ لَكَ

নিয়ত ও তালবিয়ার দ্বারা ইহরাম বাঁধা হয়ে গেল। এখন বেশী বেশী এ তালবিয়াহ পড়তে থাকবে এবং ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বিরত থাকবে।

তাওয়াফ করা (ফরয): অতঃপর মসজিদুল হারামে প্রবেশের সুন্নাতের প্রতি লক্ষ রেখে তাওয়াফের স্থানে প্রবেশ করবে। এরপর তাওয়াফের স্থানে পৌঁছেই তালবিয়াহ বন্ধ করে দিবে। হাজরে আসওয়াদের দাগের বাঁয়ে দাঁড়িয়ে প্রথমে উমরার তাওয়াফের নিয়ত করবে। তারপর দাগের উপর এসে হাজরে আসওয়াদকে সামনে করে তাকবীরে তাহরীমার মত হাত তুলবে এবং তাকবীর বলবে। অতঃপর হাত ছেড়ে দিবে। এরপর ইশারার মাধ্যমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করবে। অতঃপর পূর্ণ তাওয়াফে ইযতিবা ও প্রথম ৩ চক্করে রমল সহকারে উমরার ৭ চক্কর সম্পন্ন করবে। প্রত্যেক চক্কর শেষে হাজরে আসওয়াদকে ইশারার মাধ্যমে চুম্বন করবে। তাওয়াফ শেষে সম্ভব হলে কাউকে কষ্ট না দিয়ে মুলতাযামে হাযিরী দিয়ে দু'আ করবে, তারপর মাতাফের কিনারায় গিয়ে মাকামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে বা যেখানে সহজ হয় ওয়াজিবুত তাওয়াফ দু'রাকা'আত নামায আদায় করবে। এরপর যমযমের পানি পান করবে।

সায়ী করা (ওয়াজিব): এরপর সাফা মারওয়া এর সায়ী করার উদ্দেশ্যে হাজরে আসওয়াদকে ইশারার মাধ্যমে চুম্বন করে বাবুস সাফা দিয়ে বের হয়ে সাফা পাহাড়ে কিছুটা উপরে চড়বে এবং বাইতুল্লাহ মুখী হয়ে দু'আ করে মারওয়া পাহাড়ের দিকে চলবে। মারওয়াতে পৌঁছলে একবার সোত হয়ে গেল। এভাবে সাত সোত অর্থাৎ, ৭ বারে সায়ী সম্পন্ন করবে। মারওয়াতে কিছুটা উপরে চড়ে বাইতুল্লাহ মুখী হয়ে দু'আ করে সাফার দিকে চলবে। প্রত্যেক বার সাফা মারওয়াতে বাইতুল্লাহ মুখী হয়ে দু'আ করবে এবং প্রতিবার (পুরুষগণ) সবুজ বাতিদ্বয়ের মাঝে দ্রুত চলবে। সায়ির পর ২ রাকা'আত নফল নামায পড়বে। এবার সায়ী সম্পূর্ণ হল।

হালাল হওয়া (ওয়াজিব): এরপর মাথা মুন্ডিয়ে বা চুল ছোট করে হালাল হতে হবে। এখন আপনার উমরার কাজ সম্পূর্ণ হল।

হজ্জে ইফরাদ পালনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ইহরাম বাঁধা (ফরয): হজ্জে ইফরাদ পালনকারী হজ্জের মাস সমূহে মীকাতে পৌঁছে বা তার পূর্ব হতে (বাংলাদেশী হাজীদের জন্য বাড়ী বা ঢাকা থেকে) হাজামাত (ক্ষৌরকার্য) ইত্যাদি সমাপ্ত করে গোসল করে বা কমপক্ষে উযূ করে ইহরামের কাপড় পরিধান করে টুপি পরে দু'রাকা'আত ইহরামের নামায আদায় করবে। নামায শেষে টুপি খুলে হজ্জের নিয়ত করবে। নিয়ত শেষে অন্তত তিন বার আওয়াজ করে তালবিয়াহ পাঠ করবে। হজ্জের ইহরাম বাঁধা হল। এখন বেশী বেশী তালবিয়াহ পড়তে থাকবে এবং ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বেঁচে থাকবে। তালবিয়াহ এই

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ –
لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ –
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ –
لاَ شَرِيكَ لَكَ

তাওয়াফ করাঃ অতঃপর মক্কা মুকররমায় পৌঁছে মসজিদে প্রবেশের সুন্নত অনুযায়ী মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে তাওয়াফের স্থানে গিয়ে প্রথমে তাওয়াফে কুদূম সম্পূর্ণ করবে। তাওয়াফের সংক্ষিপ্ত নিয়ম উমরার বয়ান থেকে দেখে নিন। ৭ চক্করে তাওয়াফ সম্পন্ন করে মাতাফের

নিকটি গিয়ে মাকামে ইবরাহীমকে সামনে করে বা অন্য স্থানে ২ রাকা` আত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায এমনভাবে পড়বে, যেন তাওয়াফকারীদের সমস্যা না হয়। তারপর যমযমের পানি পান করবে, হজ্জের সায়ী এ তাওয়াফের পরই করার ইচ্ছা করলে উক্ত তাওয়াফে ইযতিবা ও ১ম তিন চক্করে রমল করতে হবে। উল্লেখ্য, ইফরাদ হজ্জ পালনকারীর জন্য তাওয়াফে কুদূমের পর মক্কায় অবস্থান কালে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে সাধ্যমত বিরত থেকে বেশী বেশী নফল তাওয়াফ করার চেষ্টা করবে। উল্লেখ্য সব ধরনের তাওয়াফের পর দু'রাকা'আত নামায পড়া ওয়াজিব। তাওয়াফকালে তালবিয়াহ উচ্চস্বরে পাঠ করবে না এবং হাজরে আসওয়াদ সামনে করা ছাড়া বাইতুল্লাহ এর দিকে সীনা ও দৃষ্টি করা যাবে না।

৮ই যিলহজ্বে করণীয়ঃ ৮ই জিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা অভিমুখে রওয়ানা হওয়া সুন্নাত। ঐ দিন মিনায় গিয়ে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং রাত্রি যাপন করে পর দিন ফজরের নামায সেখানে আদায় করা সুন্নাত। মুআল্লিমগণ সাধারণতঃ ৭ই জিলহজ্জ রাত্রেই হাজীদেরকে মিনার তাবুতে পৌঁছে দেয়। নতুন লোকদের জন্য পেরেশানী থেকে বাঁচার জন্য অগ্রিম যাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। ৮ তারিখ যোহরের পূর্বেই মিনায় পৌঁছতে হবে। সঙ্গে অতি সংক্ষিপ্ত জরুরী সামান-বিছানা এবং পরিধেয় কাপড় নিতে হবে এবং কয়েক দিনের খাবারের জন্য মুয়াল্লিমের নিকট টাকা জমা দেয়াটাই সহজ উপায়। আর মিনাতেও খানা-পিনা কিনে খাবার ব্যবস্থা আছে।

৯ই যিলহজ্বে করণীয়ঃ

উকূফে আরাফা (ফরয): ঐদিন ফজরের নামায যথা সময়ে আদায় করে (পুরুষগণ আওয়াজ করে, এবং মহিলাগণ নীরবে ১ বার) তাকবীরে তাশরীক পড়ে নিবে। নাস্তা ইত্যাদির জরুরত শেষে সূর্য উঠার পর তালবিয়া পড়তে পড়তে আরাফা অভিমুখে রওয়ানা হতে হবে। আরাফায় পৌঁছে মুয়াল্লিমের তাবুতে উকূফ করতে হবে, তাবুতে না থাকলে আরাফায় নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে অবস্থান করবে।

সংক্ষেপে উকূফের পদ্ধতিঃ এই ময়দানে পৌঁছে সেখানে আউয়াল ওয়াক্তে যোহরের নামায পড়ে দাঁড়িয়ে, আর কষ্ট হলে বসে দু'আ-কালাম-তাসবীহ-তাহলীল পড়তে থাকবে। তারপর হানাফী মাযহাব মতে আসরের সময় হলে আসর নামায পড়ে সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়া পর্যন্ত পূর্বের নিয়মে দু'আ ও যিকিরে মশগুল থাকবে। অন্য আযান শুনে কোন অবস্থায় আসরের ওয়াক্তের পূর্বে আসর পড়বে না। আরাফার ময়দানে এই অবস্থানকে 'উকূফে আরাফা' বলা হয়। সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়ার পরে এখানে বা রাস্তায় মাগরিব না পড়ে তালবিয়াহ পড়তে পড়তে মুআল্লিমের গাড়ীতে করে মুযদালিফায় রওয়ানা হবে যাবে।

মুযদালিফায় রাতে অবস্থান করা (ওয়াজিব): মুযদালিফা ময়দানে পৌঁছে ইশার ওয়াক্ত হওয়ার পর এক আযান ও এক ইকামতে প্রথমে মাগরিব ও পরে ইশার ফরয নামায আদায় করতে হবে। তারপর সুন্নাত, নফল ও বিতির পড়বে। অতঃপর মুযদালিফার খোলা ময়দানে রাতে অবস্থান করতে হবে। আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের নামায পড়ে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করে তাসবিহ-তাহলীল যিকির ও দু'আয় মশগুল থাকবে। এ সময় অবস্থান করাকে "উকূফে মুযদালিফা" বলে। এখান থেকে ৪৯ টি পাথরকণা সঙ্গে নিবে। সূর্য উঠার কিছুক্ষণ পূর্বেই তালবিয়া পড়তে পড়তে মিনার উদ্দেশ্যে পায়ে হেটে রওয়ানা হয়ে যাবে।

১০ই যিলহজ্বে করণীয়ঃ রমী করা জামরায়ে উকবা তথা বড় শয়তানকে কংকর মারা (ওয়াজিব): মিনায় পৌঁছে জরুরত সেরে এই দিন শুধুমাত্র জামরায়ে উকবায় তথা বড় শয়তানের স্থানে রমী করার জন্য ভীড় কমার অপেক্ষা করবে। কারণ এখানে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। আজকাল সাধারণত আসরের নামাযের পূর্বে ভীড় কমে না। এ জন্য আউয়াল ওয়াক্তে আসর পড়ে বা প্রয়োজনে আরো পরে বড় শয়তানের বেষ্টনীর মধ্যে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবে। এটাকেই রমী করা বলা হয়। উল্লেখ্য, ১০ই যিলহজ্বে বড় শয়তানের নিকট পৌঁছে প্রথম কংকর নিক্ষেপের পূর্বক্ষণেই তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিবে।

কুরবানী করা (মুস্তাহাব): রমী শেষে সময় থাকলে এদিন অন্যথায় পরের দিন পশু বাজারে গিয়ে বা আমানতদার কাউকে পাঠিয়ে কুরবানী করবে। হজ্বে ইফরাদ পালনকারীর জন্য কুরবাণী করা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। সুতরাং তাওফীক থাকলে কুরবানী করতে চেষ্টা করবে।

হালাল হওয়া (ওয়াজিব): বড় শয়তানকে কংকর মারার পরে এবং কুরবানী করলে কুরবানী শেষে মাথা মুন্ডাতে বা চুল ছাটতে হবে এবং এর মাধ্যমেই মুহরিম হজ্বের ইহরাম থেকে হালাল হয়ে গেল। হালাল হওয়ার সময় চেহারার নূর দাঁড়ি কোনক্রমেই মুন্ডাবেন না। যাদের এখনো দাঁড়ি রাখার সৌভাগ্য হয়নি তারা পূর্বেই এব্যাপারে পাক্কা নিয়ত করে নিবেন। যাতে করে দাঁড়ি নিয়ে রওজা শরীফ যিয়ারত করতে পারেন।

তাওয়াফে যিয়ারত (ফরয) ও সায়ী করা (ওয়াজিব): হালাল হওয়া তথা ইহরাম মুক্ত হওয়ার পর স্বাভাবিক পোষাকে বাইতুল্লাহ গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত করা ও সাফা-মারওয়াতে সায়ী করা। ১০ থেকে ১২ যিলহজ্বে সূর্য ডোবার পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত সম্পূর্ণ করতে হবে। তাওয়াফে কুদূমের পরে হজ্বের সায়ী না করে থাকলে এই তাওয়াফের পরে সাফা-মারওয়াতে সায়ী করতে হবে। সায়ী করার তরীকা উমরা এর বর্ণনায় দেখে নিন। সায়ীর পরে দু'রাকা'আত নামায পড়বে। এরপর মিনা ফিরে আসবে।

১১, ১২ ও ১৩ই জিলহজ্বের করণীয়:

তিন জামরায় কংকর মারা ওয়াজিবঃ ১১ ও ১২ যিলহজ্বে ভীড় থেকে বাঁচার জন্য বাদ আসর প্রথমে ছোট, পরে মাঝারী সবশেষে বড় জামরার বেষ্টনীর মধ্যে ৭টি করে কংকর মারবে। এ কয়দিন মিনায় রাত যাপন করা সুন্নাত। উল্লেখ্য, ১২ই যিলহজ্বে ৩ জামরায় কংকর মেরে কেউ মক্কা চলে গেলে কোন অসুবিধা নাই। তবে বিশেষ কোন জরুরত না থাকলে ১৩ই যিলহজ্বে বিকাল ৩টার দিকে পর্যায়ক্রমে তিন জামরায় কংকর

মেরে মক্কায় যাওয়া উত্তম। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৩ যিলহজ্বে কংকর মেরে মক্কা গিয়েছিলেন। ১৩ যিলহজ্বে আসর পর্যন্ত তাকবীরে তাশরীক পড়তে হবে।

তাওয়াফে বিদা (ওয়াজিব): যখন মক্কা শরীফ থেকে চলে আসার সময় হয় তখন শান্তভাবে কয়েক ঘণ্টা পূর্বে স্বাভাবিক পোষাকে বাইতুল্লাহ শরীফে এসে ৭ চক্কর তাওয়াফ সম্পন্ন করবে। তারপর ওয়াজিবুত তাওয়াফ দু’রাকা‘আত নামায পড়ে যমযমের পানি পান করে আবারও বাইতুল্লাহ যিয়ারতের তাওফীক লাভের জন্য মনে প্রাণে দু‘আ করা অবস্থায় চলে আসবে। ইহাকে তাওয়াফে বিদা বলা হয়। এ তাওয়াফের মধ্যে ইযতিবা ও রমল নেই এবং পরে কোন সায়ী নেই উল্লেখ্য প্রতিবার মসজিদে হারামে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় সুন্নাতের প্রতি খেয়াল রাখবে।

হজ্জে তামাত্তুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

যারা তামাত্তু হজ্জ করতে চায় তারা প্রথমে উমরার বর্ণিত নিয়মে উমরা পালন করে মাথা মুন্ডিয়ে হালাল হয়ে যাবে। (এরপর যে কয়দিন মক্কা শরীফে থাকবে, বেশী বেশী নফল তাওয়াফ করবে। বেশী বেশী নফল উমরা করা থেকে নফল তাওয়াফ করাই উত্তম।) তারপর মিনার উদ্দেশ্য রওয়ানা হওয়ার পূর্বে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জে ইফরাদের বর্ণিত নিয়মে হজ্জ সম্পূর্ণ করবেন।

হজ্জে কিরানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

আর যারা হজ্জে কিরান করতে চান তারা মীকাত থেকে বা তার পূর্ব হতে একত্রে উমরা ও হজ্জের নিয়ত করে ইহরাম বাঁধবেন। তারপর তারা উমরাহ শেষে ইহরাম অবস্থায় থাকবেন। তারা উমরাহ করে হালাল হতে পারবেন না। হজ্জে সকল কাজ সম্পন্ন করে পূর্বে বর্ণিত নিয়মে মাথা মুন্ডিয়ে হজ্জ থেকে হালাল হওয়ার সময় হজ্জ ও উমরার উভয় ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, কিরান ও তামাত্তু হজ্বকারীর জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব এবং তাদের জন্য মাথা মুন্ডানোর পূর্বেই কুরবানী করা ওয়াজিব। আর ব্যাংকের ওয়াদাকৃত সময় সাধারণত ঠিক থাকে না সে জন্য হালাল হওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এ জন্য তামাত্তু ও কিরানকারীরা কোনো অবস্থায় ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করবে না।

মহিলাদের হজ্জের পার্থক্য

মহিলাগণ স্বাভাবিক পোষাকেই ইহরাম বাধবে এবং মাথা ঢেকে নিবে চেহারা খোলা রাখবে না বরং চেহারার পর্দা করবে এবং এমনভাবে নেকাব লাগাবে যেন চেহারার সাথে কাপড় লেগে না থাকে। তালবিয়াহ নিম্ন আওয়াজে পড়বে। তাওয়াফের মধ্যে ইযতিবা ও রমল করবে না। সায়ীতে সবুজ বাতিদ্বয়ের মাঝে স্বাভাবিক চলবে। চুলের আগা থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ কেটে হালাল হবে। পুরুষদের থেকে পৃথক হয়ে মাতাফের কিনারা দিয়ে বা ছাদে গিয়ে তাওয়াফ করবে। হায়েয অবস্থায় তাওয়াফ করবে না, চলে আসার সময় হায়েযা হলে তাওয়াফে বিদা মাফ হয়ে যাবে। নামায সমূহ মক্কা বা মদীনার অবস্থানগৃহে আদায় করবে, এত সাওয়াব বেশী হবে। মক্কা শরীফে শুধু তাওয়াফের জন্য এবং মদীনা শরীফে নির্দিষ্ট সময়ে শুধু রওজা যিয়ারতের জন্য মসজিদে যাবে।

হজ্বের মধ্যে ঘটে যাওয়া ভুলসমূহ

হজ্ব ইসলামের একটি স্তম্ভ। বিত্তবানদের উপরে জীবনে একবার ফরয; দেরি না করা ওয়াজিব। আর স্বাস্থ্য ও অর্থ থাকলে প্রতি চার বছরে এক বার বাইতুল্লাহ শরীফে নফল হজ্ব বা উমরার মাধ্যমে হাযির হওয়া বাইতুল্লাহ শরীফের হক।

১.‘হজ্বে বদল’-এ যারা যায়, পাঠানেওয়ালা যদি তামাত্তু বা যে কোনো হজ্বের অনুমতি দেয় বা সে অনুমতি নিয়ে নেয় তাহলে ফাতওয়া হলোদ যদিও ইফরাদ করা উত্তম, তবে তামাত্তু করা জায়িয। হাকীমুল উম্মত থানবী রহ., মুফতী শফী রহ. ও মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী রহ. এই মত প্রকাশ করেছেন। এছাড়া বর্তমান যুগের কোনো আলিমের এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। সূত্র: জাওয়াহিরুল ফিকহ (পৃ. ৫০৮-৫১৬) ইমদাদুল আহকাম (২য় খণ্ড, পৃ.১৮৬)

২.সাধারণত মাসআলার কিতাবগুলোতে লেখা আছে যে, মক্কা ভিন্ন শহর আর মিনা ভিন্ন শহর। অতএব দুই শহর মিলিয়ে যদি কেউ পনেরো দিন বা তার বেশি থাকার নিয়ত করে তাহলে সে মুকীম হবে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মুকীম বা মুসাফির হওয়ার মাসআলা পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত। পরিস্থিতি পাল্টে গেলে মাসআলা পাল্টে যাবে। আর বর্তমান পরিস্থিতি হলো মক্কা ও মিনা এখন দুই শহর নেই, আবাদী মিলে এখন এক হয়ে গেছে। এমনকি মুযদালিফা-আরাফা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে। অপরদিকে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মিনার সমস্ত ইন্তেজামী কাজ মক্কার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং আবাদী মিলে যাওয়া ও সরকার কর্তৃক ইন্তেজামী বিষয় এক করে নেওয়ায় মিনা মক্কা শহরের মধ্যে দাখিল হয়ে যাবে, বা কমপক্ষে মিনাকে মক্কা শহরের উপকণ্ঠ/শহরতলী বলা হবে।

অতএব কিতাবের উল্লিখিত মাসআলা পরিস্থিতি পাল্টে যাওয়ার কারণে কার্যকর থকবে না। সুতরাং এখন যদি মক্কা-মিনা মিলিয়ে কেউ পনেরো দিন বা তার বেশি থাকার নিয়ত করে তাহলে সে মুকীম গণ্য হবে। মাসআলাটি ভালো করে বুঝে রাখা দরকার। কারণ অনেক আলিমও পরিস্থিতি না জানার কারণে পুরনো কিতাবের মাসআলা বলে থাকেন।

এটার একটা নমুনা আমদের ঢাকাতেই আছে। যেমন, একটা সময় ছিল সফরের উদ্দেশ্যে কেউ ঢাকা ত্যাগ করে বিমানবন্দরে গেলে তাকে মুসাফির বলা হতো। কারণ, তখন ঢাকা আর বিমানবন্দরের মাঝে বেশ ফাঁকা ছিল; কোনো আবাদী ছিল না। আর সরকারও তখন এয়ারপোর্ট-উত্তরা এলাকাকে শহরের মধ্যে শামিল করে নাই। তখন উলামাদের ফাতওয়া ছিল এয়ারপোর্ট গেলে সে মুসাফির গণ্য হবে। কিন্তু পরবর্তীতে এই ফাঁকাটা বসতিপূর্ণ হয়ে যাওয়ায় এবং সরকার টঙ্গী ব্রিজ পর্যন্ত শহরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করায় এখন ফাতওয়া হচ্ছে কেউ বিদেশ ভ্রমনের জন্য এয়ারপোর্ট গেলে তিনি মুসাফির হবেন না; বরং মুকীম থাকবেন যতক্ষণ না বিমান উপরে উঠে। এখানে যে মাসআলা, মক্কা-মিনায়ও সেই মাসআলা।

কাজেই যেহেতু তারা মুকীম হলো তাই তাদের জন্য আরো কয়েকটা মাসআলা মানতে হবে।
(ক) তাদের এখন মক্কা-মিনা-মুযদালিফা-আরাফায় চার রাক'আত বিশিষ্ট নামায চার রাকা'আতই পড়তে হবে। (মুসলিম ৩য় খণ্ড হাদীস নং ৬৮৭)

(খ) মিনায় ১২ বা ১৩ তারিখ পর্যন্ত থাকতে হয়। এর মধ্যে যদি কোনো দিন শুক্রবার হয় তাহলে মিনাতে জুমু'আ পড়তে হবে। কারণ, এটা শহর বা শহরতলী। (তাতারখানিয়া ২য় খণ্ড পৃ.৫৫৩, মাসআলা নং-৩২৭৬)
অথচ আমি এবার (২০১২ ইং) হজ্বে গেলাম। খবর নিলাম; কেউ যুহর পুরা পড়েছে, কেউ দুই রাকা'আত পড়েছে। অথচ তাদের অবস্থান মিনা-মক্কা মিলে পনেরো দিনের বেশি থাকা হচ্ছে এবং শহরতলীতে অবস্থান করছে। তারপরেও তারা জুমু'আ তো পড়েই নাই, আবার যুহরের মধ্যে কসর করেছে। সঠিক মাসআলা না জানার কারণে তারা এ সমস্ত ভুল করেছে এবং এখনো অনেকে করছে।

(গ) নিসাবের মালিক হওয়ার কারণে দেশে যে প্রত্যেক বছর একটা কুরবানী করতো, মুকীম হয়ে যাওয়ায় ঐ কুরবানিটা বহাল থাকবে। চাইলে দেশেও করতে পারে, চাইলে সেখানেও করতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, হজ্বের কুরবানী ভিন্ন। যা তামাত্তু বা কিরান করার কারণে হারামের সীমানায় ১২ই জিলহজ্বের মধ্যে করতে হয়। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড পৃ.৫১৫)

মহিলাদের কিছু ভুলঃ
(ক) চেহারা খোলা রাখা। মাসআলা হলো চেহারা দেখা যাবে না; তবে বোরকার নেকাব চেহারার সাথে লেগে থাকবে না। এর জন্য এমন কিছু ব্যবহার করতে হবে যাতে করে নেকাব চেহারার সাথে না লেগে না থাকে। (ফাতাওয়ায়ে শামী ২য় খণ্ড পৃ.৫২৭)

(খ) মহিলাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত হারামের জামা'আতে ও জুমু'আয় যাওয়া মাকরুহে তাহরীমী। অথচ দেখা যায় যে, মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত জামা'আতে যাচ্ছে! যার কারণে ভিড় বেশি হচ্ছে। তারাও গুনাহগার হচ্ছে, পুরুষরাও গুনাহগার হচ্ছে। আর হাজারো পুরুষের ধাক্কা খাচ্ছে, ধাক্কা দিচ্ছে। আর পুরুষের পাশে দাঁড়ানোর কারণে পুরুষের নামাযও নষ্ট হচ্ছে। তারা যাচ্ছে ফযিলতের জন্য; অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো মহিলা হজ্ব বা উমরার জন্য মক্কায় এসে ঘরে নামায পড়লে এক লাখের চেয়ে বেশি সওয়াব পাবে (মুসনাদে আহমদ ৬ষ্ঠ খন্ডঃ পৃ.২৯৭, ৩০১। হাদীস নং-২৬৫৯৮, ২৬৬২৬) । তেমনিভাবে মদীনার মসজিদে নববী থেকে তার ঘরের নামাযের ফযিলত বেশী । অতএব মহিলারা জুমু'আয়ও যাবে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেও যাবে না। তবে তাওয়াফ করতে গিয়েছে এমন সময় কোনো নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল সে সময় মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নামায পড়ে নিতে পারবে। চাই তাওয়াফ হজ্বের হোক বা উমরার হোক, বা অন্য কোনো তাওয়াফ হোক।

কয়েকটি মারাত্মক ভুল:
(ক) এক শ্রেণীর হাজী সাহেব আছে, তারা সারাদিন মোবাইল বা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে থাকে। অথচ জানদারের ছবি তোলা হারাম কাজ (বুখারী শরীফ ৪র্থ খণ্ড পৃ.৭১, হাদীস নং ৫৯৫০) । তারা হজ্বে গিয়েও হারাম শরীফের মধ্যে এই হারাম কাজ করছে। হজ্বের সফরে হারাম কাজ করলে হজ্বে মাবরূর নসীব হয় না।

(খ) অনেক পুরুষ ইহরাম খোলার সময় যেখানে শরীয়ত বলেছে মাথা মুণ্ডানোর কথা সেখানে তারা দাড়িও মুণ্ডায়। আমাদের শায়খ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ. বলতেন,"দেশে অন্যায় কাজ করলে, আল্লাহর ঘরে গিয়েও তা করলে; এভাবে তোমার কয়েক লাখ টাকার হজ্ব ঐ জায়গায়ই দাফন করে রেখে আসলে"।

হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যখন কেউ দাঁড়ি-কাটা অবস্থায় 'আস্-সালাতু ওয়াস্-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!' বলে তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দেন না। কারণ সে প্রতিদিন রাসূলের কলিজায় খুর চালায়। তাই এমন কেউ সালাম দিলে তিনি চেহারা মোবারক আরেক দিকে ফিরিয়ে নেন। এমন অবস্থায় একশত বার হজ্ব করলেও তার হজ্বে মাবরূর নসীব হবে না।

(গ) 'তালবিয়া' ইনফিরাদী আমল। সবাই যার যার তালবিয়া পড়বে। দেখা যায়, অনেকে লিডারের সাথে তাল মিলিয়ে তালবিয়া পড়তে থাকে। অথচ এর কোনো প্রমাণ নাই।

(ঘ) আরাফা ও মুযদালিফার মধ্যখানে ৫ কিলোমিটার প্রশস্থ একটি ময়দান আছে, যেখানে অনেক টয়লেট ও গাছপালা আছে এ সব থেকে অনেকেই এটাকে মুযদালিফা মনে করে এখানে অবস্থান করে, অথচ এটা আরাফার মধ্যে দাখিল নয় এবং মুযদালিফার মধ্যে ও দাখিল নয়, এটা ভিন্ন একটা ময়দান, এখানে হজ্বের কোন কাজ নাই। এখানে মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়া জায়িয নাই, এবং রাত্রে অবস্থান করাও জায়িয নাই। এবং বা'দ ফজর এখানে উকূফে করলে উকূফে মুযদালিফাও আদায় হবে না। অথচ যারা পায়দল আরাফা থেকে মুযদালিফায় যায় তাদের অনেকে এ ভুলটা করে। তাদের উপর 'দম' ওয়াজিব হয়ে যায় তাও তারা না জানার কারণে আদায় করে না।

(ঙ) ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী না করানো উচিত। কারণ এতে কখনো ১০ তারিখে বড় শয়তানকে কংকর মারার আগে কুরবানী হয়ে যায়। আবার কখনো কুরবানী সম্পন্ন হওয়ার আগে মাথা মুণ্ডানো হয়ে যায়। আর এ উভয় ভুলের দরুন তামাত্তু ও কিরানকারীর উপর দম ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ তাদের জন্য ১০ তারিখে এই তিনটি কাজে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী।

(১) বড় শয়তানকে কংকর মারা, (২) কুরবানী করা ও (৩) মাথা মুণ্ডানো।

এজন্য নিজেরা বা বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে কুরবানীর ব্যবস্থা করা জরুরী। কংকর মারার পর কুরবানী করবে, তারপর কুরবানী সম্পন্ন হওয়ার পর মাথা মুণ্ডাবে। মাথা মুন্ডানোর দ্বারা বা চুল ছোট করার দ্বারা হালাল হয়ে যাবে, তখন ইহরাম অবস্থায় যে সব কাজ নিষিদ্ধ ছিল তা এখন জায়িয হয়ে যাবে। উল্লেখ্য ইহরামের চাদর খুললে ইহরাম খোলা হয় না বা হালাল হওয়া যায় না।